প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় প্রশাসনের ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ভারতীয় জন প্রশাসনের বয়স ১১৫ বছরেরও কিছু বেশি। ভারতীয় রাজতন্ত্র বহু প্রাচীনকাল থেকেই সরকারি কাজকর্ম প্রয়োগ করার জন্য জন প্রশাসনকে ব্যবহার করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সরকারি ব্যবস্থার সূচনা হয় বৈদিক যুগে। মুঘল শাসনের পত্তন অর্থাৎ ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। অসংখ্য প্রশাসনিক সংগঠনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় প্রশাসনিক ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য সর্বযুগেই পরিলক্ষিত হয়। **প্রথমটি** হল, প্রাথমিক একক (primary unit) হিসেবে গ্রামের প্রাধান্য ও **দ্বিতীয়টি** হল, কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ—এই দুই বিপরীত প্রবণতার মধ্যে সমন্বয় সাধন। বর্তমান ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রাচীন ব্যবস্থাটিরই এক উন্নত সংস্করণ। বলা যায়, আধুনিক জন প্রশাসন সাবেকি জন প্রশাসনের ভিত্তির উপরই রচিত।

প্রাচীন ভারতে রাজ্যগুলিকে শাসন করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেবল রাজার হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। একাজে তাঁকে সাহায্য করতেন অসংখ্য আধিকারিক (officers)। ঐতিহাসিক বেণী প্রসাদের মতে, রাজাকে ঘিরে থাকত তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মুখ্য আধিকারিকবৃন্দের (principal officers) একটি বৃত্ত।[১] রামায়ণ ও মহাভারতে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা ও তাঁদের বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখ আছে। মনুস্মৃতি ও শুক্রনীতি-তেও এগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে। তবে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যালয়ের (office) প্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা পাই কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে**। ইতিমধ্যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের আমলে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি চূড়া স্পর্শ করেছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রশাসনের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ে ও প্রশাসন মনুষ্যজীবনের সবকটি দিক নিয়েই মাথা ঘামাতে শুরু করে। গুপ্তযুগে প্রশাসনিক সংস্থাগুলি আরও বেশি উন্নত হয়।

প্রাচীন ভারতে বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনিক স্বার্থে সাম্রাজ্যগুলিকে কতকগুলি প্রদেশে (province), প্রদেশগুলিকে কয়েকটি জেলায় (district) এবং জেলাগুলিকে কতিপয় নাগরিক ও গ্রামীণ কেন্দ্রে (urban and rural centres) বিভক্ত করা হয়েছিল। রাজ্য প্রশাসন কয়েকটি বিভাগের হাতে ন্যস্ত ছিল। বৈদিক যুগে এইসব বিভাগের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। ক্রমশ, এইসব বিভাগের সংখ্যা ও তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসনিক নীতির ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, 'ক্রমোচ্চ স্তরবিভাগ' (hierarchy) নীতিটিকে একটি কার্যোপযোগী কাঠামো দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের বীজ সেযুগেই দেখা গিয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের আমলে পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনকে (observation and inspection) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই যুগে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির অস্তিত্ব ছিল :

(ক) প্রাসাদ বিভাগ (Palace department),

(খ) সৈন্য বিভাগ (Army department),

(গ) পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিষয়ের বিভাগ (Department of External Affairs),

(ঘ) রাজস্ব বিভাগ (Revenue department) এবং

(ঙ) অর্থ বিভাগ (Department of Treasury)

প্রাচীন ভারতবর্ষে সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। মৌর্য শাসনব্যবস্থায় তিন শ্রেণীর অধিকারিকের উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন—নাগরিক আধিকারিক, সামরিক আধিকারিক ও গ্রামীণ আধিকারিক। এইসব আধিকারিকদের ঊর্ধ্বে স্থান পেতেন মন্ত্রী বা উপদেষ্টারা। কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের অধীনে রাজ্য, জেলা ও গ্রাম—এই তিন স্তরের আধিকারিকবৃন্দ কাজ করতেন। Altekar-এর মতে, তৎকালীন যুগেও এখনকার মতো সর্বভারতীয়, রাজ্যস্তরের ও অধীনস্থ স্তরের কৃত্যক (service) ছিল কিনা—এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। তবে, মৌর্য যুগের 'মহামাত্য' ও গুপ্তযুগের 'কুমারামাত্য'-কে সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India Services) হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, রাজা মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় আধিকারিকদের নিয়োগ করতেন। রাজা, প্রধানমন্ত্রী ও পুরোহিত—এই তিনে মিলে তৈরি হত তৎকালীন রাষ্ট্রনিয়োগাধিকার।

প্রাচীন ভারতে একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মতো সংগঠন ছিল যেখানে যাবতীয় সরকারি নথি সংরক্ষিত থাকত। মৌর্য যুগে ও চোল রাজত্বকালে এ ধরনের কার্যালয়ের উল্লেখ আমরা পাই। রাজা ব্যক্তিগত সচিব (Personal Secretary) নিয়োগ করতেন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতীয় প্রশাসনকে সম্যকভাবে বুঝতে গেলে কয়েকটি যুগে ভাগ করে বোঝা দরকার। এগুলি হল :

(১) প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন,

(২) রাজপুত যুগের প্রশাসন,

(৩) সুলতানি যুগের প্রশাসন,

(৪) মুঘল যুগের প্রশাসন,

(৫) ব্রিটিশ যুগের প্রশাসন ও

(৬) স্বাধীন ভারতের প্রশাসন।

(১) প্রাচীন ভারতীয় প্রশাসন : প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূচনা। এযুগে পরিকল্পিত রাস্তা ও জলনিকাশী বন্দোবস্তের উল্লেখ আছে। বোঝা যায়, নগরগুলিতে পৌরশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা নাগরিকদের চাহিদার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত। এছাড়া, একটি বিশেষ ধরনের ঘরবাড়ি, বিশেষ ধরনের পরিমাপ ব্যবস্থা ও বিশেষ ধরনের অক্ষর চালু ছিল। এ থেকেই সুস্পষ্ট যে, হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো-র পুরো অঞ্চলটিতে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

বৈদিক যুগের সূচনা হয় সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের পর। প্রাচীন বৈদিক বা ঋগ্বেদের যুগে প্রশাসনিক এককগুলি (administrative units) 'কুল', 'গ্রাম', 'বিশ' ও 'জাতি' নামে পরিচিত ছিল। ঋগ্বেদের যুগে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রতম একক (smallest unit) ছিল পরিবার ও বৃহত্তম একক (biggest unit) ছিল রাষ্ট্র। এযুগে রাজতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত ছিল। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। রাজারা সাধারণত স্বৈরাচারি বা প্রজাবিদ্বেষী হতেন না। প্রজাস্বার্থে সারাজীবন কাজ করে যাবেন—এই মর্মে অভিষেকের সময় তাঁদের শপথ নিতে হত।

বৈদিক পরবর্তী যুগে শক্তিশালী রাজ্যের উত্থান হয়। আধিকারিকদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। এঁরা রাজাকে প্রশাসনে সাহায্য করতেন।

সরকার পরিচালনায় রাজা মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যও গ্রহণ করতেন। মন্ত্রিপরিষদের প্রধান 'মুখ্যামাত্য' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজার স্বেচ্ছাচার হ্রাস করার জন্য পূর্ববর্তী যুগের মতোই এযুগে সভা ও সমিতির অস্তিত্ব ছিল। বিচার-বিভাগীয় প্রশাসনের শীর্ষেও থাকতেন রাজা। তাঁকে অন্যান্য বিচার-বিভাগীয় আধিকারিকবৃন্দ সহায়তা করতেন।

রামায়ণের যুগে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রশাসন ছিল যথেষ্ট পরিণত। ফলত, মানুষ উন্নত ও সুখী জীবনযাপন করত। প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিতেন মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদবর্গ।

মহাভারতের যুগেও মূলত রাজতান্ত্রিক সরকারই গঠিত হত। রাষ্ট্রকে বলা হত 'সপ্তাঙ্গী'। উচ্চ আদর্শ ও কর্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন রাজা। প্রজাদের মঙ্গলের দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

বৌদ্ধ যুগে 'মহাজনপদ'-এর অস্তিত্ব ছিল। এযুগে অসংখ্য প্রজাতন্ত্রের উল্লেখও পাওয়া যায়। এইসব প্রজাতন্ত্রের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল চারটি বৃহদাকার রাজ্য—অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। প্রজাতন্ত্রগুলিতে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল 'সভা'। এখানে সাধারণ জনগণ ও এলিট শ্রেণী দুই-এরই অস্তিত্ব ছিল। রাজতন্ত্রের চূড়ায় ছিলেন রাজা স্বয়ং। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হতেন। স্বীয় কাজের জন্য তিনি সভার (council) কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন।

মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থার কয়েকটি অঙ্গ ছিল। এগুলি হল : (ক) রাজা, (খ) অমাত্য, (গ) জনপদ, (ঘ) দুর্গ, (ঙ) অর্থদপ্তর, (চ) সেনাবাহিনী, (ছ) মিত্রবর্গ, (জ) মন্ত্রিপরিষদ, (ঝ) কূটনীতি, (ঞ) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

(ক) রাজা : রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসনবিভাগীয়, আইনবিভাগীয়, বিচারবিভাগীয় ও অর্থনৈতিক—যাবতীয় ক্ষমতা তাঁরই হাতে ন্যস্ত ছিল। বলা হত, প্রজার সুখেই রাজার সুখ ও প্রজার মঙ্গলেই তাঁর মঙ্গল। নিজস্বার্থ নয়, প্রজাস্বার্থই তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়। রাজাকে নানা কাজে সাহায্য করতেন মন্ত্রিপরিষদ, অসংখ্য আধিকারিক ও ভৃত্য। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' অনুযায়ী, রাজা ধর্মরক্ষা করতেন। তিনি 'ধার্মিক (বর্তমান অর্থে ধার্মিক নয়) অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হতেন। তিনিই হতেন রাষ্ট্রের জীবন। শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে রাজার ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। তাঁকে উপকারী, নীতি-নির্ধারক, চিন্তাবিদ, নির্ভীক ও স্বীয় নিয়ন্ত্রণযুক্ত হতে হত। এছাড়াও তাঁকে হতে হত বিজেতা, পররাজ্য আক্রমণকারী ও স্বীয় রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধিতে আগ্রহী। অযোগ্য রাজাকে সরিয়ে দেওয়া হত।

(খ) অমাত্য : স্তরবিভাগে (hierarchy) রাজার ঠিক নীচেই অমাত্যের স্থান ছিল। মৌর্য যুগে অমাত্য এক বিশেষ পদ অধিকার করে থাকতেন। বর্তমান যুগে এ ধরনের পদ প্রায় অজানা। তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি ছিলেন এবং মর্যাদায় ছিলেন এখনকার ক্যাবিনেট সেক্রেটারিদের সমতুল। তিনি বিশেষ মন্ত্রিপদও অধিকার করে থাকতেন। এছাড়া অমাত্য প্রশাসনের খুঁটিনাটি দেখাশোনা করতেন। কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র** পড়ে আমরা অমাত্য সম্পর্কে ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর ইত্যাদি পণ্ডিতদের মতামত জানতে পারি। আমরা জানতে পারি যে, কেবলমাত্র যোগ্য, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও পণ্ডিত মানুষরাই 'অমাত্য' পদে মনোনীত হতে পারতেন। এঁরা অত্যন্ত কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান ও নীতি নির্ধারণে পারদর্শী হতেন। এঁদের উচ্চ বেতন, ভাল বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হত।

কৌটিল্য যাবতীয় মন্ত্রী, অমাত্য ও বিভাগীয় প্রধানদের ১৮টি ভাগে ভাগ করেছেন।[২] এঁরা হলেন :

(১) মন্ত্রী,

(২) পুরোহিত,

(৩) সেনাপতি,

(৪) যুবরাজ,

(৫) দৌবারিক (প্রাসাদ রক্ষকদের প্রধান),

(৬) অন্তরবংশিকা (রাজার দেহরক্ষীদের প্রধান),

(৭) প্রশাস্ত্র (শাসক),

(৮) সমাহত্র (কালেক্টর জেনারেল),

(৯) সন্নিধত্র (প্রধান ট্রেজারার),

(১০) প্রদেষ্ট্র (কমিশনার),

(১১) নায়ক (পুররক্ষী),

(১২) পৌর (পুরপ্রধান),

(১৩) কর্মান্ত (খনির তত্ত্বাবধায়ক),

(১৪) মন্ত্রিপরিষদ-অধ্যক্ষ (মন্ত্রিপরিষদের প্রধান),

(১৫) দণ্ডপাল (সেনাবিভাগের অফিসার),

(১৬) দুর্গাপাল (দুর্গসমূহের অভিভাবক),

(১৭) অন্তপাল (রাজ্যের সীমানা বিষয়ক প্রধান আধিকারিক) ও

(১৮) অতিবাহিকা (রাজ্যের বনবিষয়ক প্রধান আধিকারিক)।

(গ) জনপদ : 'জনপদ' বলতে জনগণ ও তাদের বসবাসের জন্য ভূখণ্ড—উভয়কেই বোঝায়। ভূখণ্ডের সঠিক সীমানা থাকা প্রয়োজন। পর্বত, নদী বা জঙ্গলের মতো প্রাকৃতিক সীমানাযুক্ত হত জনপদের ভূখণ্ড। এর মৃত্তিকা উর্বর হওয়ার উপর নির্ভর করত জনপদের উন্নয়ন। জনপদের মানুষদের হতে হত বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র।

(ঘ) দুর্গ : রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গ ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে দুর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। দুর্গগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য, জল, ঔষধ ও নানা দরকারি জিনিসপত্র থাকত।

(ঙ) অর্থ দপ্তর : রাজ্যের মেরুদণ্ড ছিল অর্থ দপ্তর। অর্থকড়ি নিপুণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত। রাজ্যের আয়ের উৎস ছিল নানাবিধ কর। এগুলির মধ্যে রপ্তানি কর, বিক্রয় কর ও গ্রামীণ কর ছিল উল্লেখযোগ্য।

(চ) সেনাবাহিনী : রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত সেনাবাহিনী। একজন উত্তম সৈনিক বিশ্বস্ত, দুঃসাহসী ও সামরিক বিজ্ঞানে পারদর্শী হতেন। সংক্ষেপে, একজন ক্ষত্রিয়ের যাবতীয় গুণাবলী পাওয়া যেত তাঁর মধ্যে। সেনাবাহিনীর আধিকারিকবৃন্দ আরও নানাবিধ গুণের অধিকারী হতেন।

(ছ) মিত্রবর্গ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'মিত্র' বলতে বোঝায় বন্ধু-মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র।

(জ) মন্ত্রিপরিষদ : মন্ত্রিপরিষদ রাজাকে নানা কাজে সাহায্য করত। পরিষদের শীর্ষে থাকতেন প্রধানমন্ত্রী। রাজার ঠিক পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন মহামন্ত্রী বা মহামাত্য। মৌর্য যুগের মন্ত্রিপরিষদ ব্রিটিশ মডেলের তুলনায় অনেক বেশি মার্কিন মডেলের কাছাকাছি বলে অনেকে মত পোষণ করেন। মন্ত্রীদের আনুগত্য ছিল সরাসরি রাজার কাছে, কোনো নির্বাচিত সংগঠনের (body) কাছে নয়। রাজাই মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন। মন্ত্রীরা সাধারণত হতেন কুলীন বা সৎকুল থেকে জাত বা উচ্চ বর্ণযুক্ত। তাঁরা বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দুঃসাহসী,

ধৈর্যশীল; জনপ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ, নানাবিধ কাজে পারদর্শী ও বিশ্বস্ত হতেন। রাজা কোনো একজন মন্ত্রী বা একত্রে জনাকয়েক মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতেন। মন্ত্রিপরিষদ একটি সাংবিধানিক সংগঠন ছিল। উচ্চপদে নিয়োগের ব্যাপারে রাজা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ নিয়ে থাকতেন।

(ঝ) কূটনীতি : কূটনীতিকে একটি উচ্চ শিল্পকলা হিসেবে গণ্য করা হত। প্রতিটি রাজার একজন করে বিদেশমন্ত্রী থাকতেন, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণে যাঁর বিশেষ ক্ষমতা থাকত। পররাষ্ট্র বিজয়ের বিভিন্ন উপায় বর্ণিত হয়েছে **অর্থশাস্ত্র** ও **শুক্রনীতি**—এই দুটি গ্রন্থেই। গুপ্তচর নিয়োগ, শত্রুকে ঠকানো, খুন করা, বিষ প্রদান, মাদকদ্রব্য প্রেরণ—ইত্যাদি প্রণালীর কথা কৌটিল্যই বলে গেছেন। তাঁর মতে, তিন ধরনের দূত হত। প্রথম ধরনের দূতেরা মন্ত্রীদের যাবতীয় ক্ষমতাবিশিষ্ট হতেন ও যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণার পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় ধরনের দূতেদের ক্ষমতা ছিল এক-চতুর্থাংশ কম। তৃতীয় ধরনের দূতেদের ক্ষমতা ছিল অর্ধেক কম। এঁরা কেবলমাত্র সংবাদ আদান-প্রদানকারী ছিলেন।

(ঞ) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন : প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছিল। 'পুর' বা 'নগর' এবং জনপদগুলির নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ছিল। গ্রাম ও শহরের মানুষেরা তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। নানা ধরনের সভা ও সমিতি স্থানীয় বিষয়গুলি দেখভাল করত।

গুপ্তযুগে রাজতান্ত্রিক শাসনবব্যস্থা বলবৎ ছিল। সরকারি কাজে রাজার সহায়ক ছিল মন্ত্রিপরিষদ। সমস্ত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বিভক্ত ছিল কয়েকটি বিভাগে। এই বিভাগগুলির দায়িত্বে থাকতেন বিভিন্ন আধিকারিক। সমগ্র সাম্রাজ্যটি কয়েকটি প্রদেশে (province) বিভক্ত হত। প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি 'অঞ্চলে' (region) বিভক্ত হত। প্রতিটি অঞ্চল বিভক্ত হত কয়েকটি 'বিষয়ে' (vishay)। ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক (unit) ছিল গ্রাম। গ্রামের শীর্ষে থাকতেন 'গ্রামীণ' যাঁকে গ্রামসভা নানা বিষয়ে সাহায্য করত।

(২) রাজপুত যুগের প্রশাসন : এই যুগেও রাজতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব ছিল। মন্ত্রিপরিষদ নানা কাজে রাজাকে সাহায্য করত। রাষ্ট্র কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট এককে বিভক্ত ছিল। বৃহত্তম একক ছিল 'প্রান্ত' (prant)। গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এই সময়ে অনেকটা হ্রাস পায়। এর কারণ, এই যুগের শাসনব্যবস্থা গুপ্তযুগীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগোচ্ছিল।

(৩) সুলতানি যুগের প্রশাসন : এই যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল মূলা সামরিক এবং শাসকবর্গ ছিলেন স্বৈরাচারি। যেহেতু কারুর একার পক্ষে রা পরিচালনা কার্যত অসম্ভব, তাই সুলতানি শাসকদেরও প্রয়োজন ছিল সাহায্য উপদেশের। তবে সুলতানের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই রাজনৈতিক আইনগত ও সামরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত। বিচার-সংক্রান্ত প্রশাসনে দায়িত্বেও থাকতেন তিনিই। উপদেষ্টাদের কাছ থেকে তিনি প্রয়োজনমতো উপদে গ্রহণ করতে পারতেন।

একেবারে প্রথমদিকে তুর্কি শাসন ছিল সম্পূর্ণ সামরিক। দেশটি বিভক্ত হ কয়েকটি অঞ্চলে। প্রতিটি অঞ্চলের দায়িত্বে থাকতেন একজন করে মুখ্য সামরিক শাসক। এছাড়াও রাজাকে সাহায্য করতেন মন্ত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী ওয়াজির (Wazir) নামে পরিচিত হতেন; তাঁর হাতেই থাকত যাবতীয় প্রশাসনের দায়িত্ব। তাঁর নিজস্ব সচিবালয় থাকত। এছাড়াও তাঁকে সাহায্য করতেন একসারি আধিকারিক। ওয়াজিরের ঠিক পরেই থাকতেন সামরিক বিভাগের প্রধান। এছাড়াও থাকতেন দুজন জনপালনকারী দেওয়ান (civil dewan)। এঁদের মধ্যে প্রথমজন যাবতীয় ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পণ্ডিতদের সম্পর্কে দেখাশোনা করতেন। দ্বিতীয় জনের দায়িত্বে থাকত যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রশাসনিক সুবিধের জন্য রাষ্ট্রকে কয়েকটি 'প্রান্তে' ভাগ করা হত। কেন্দ্রের মতোই প্রান্তপ্রধানেরাও কয়েকটি বিভাগ গঠন করতেন। প্রান্তগুলি কয়েকটি 'শিকোতে (Shiko) বিভক্ত ছিল; প্রতিটি শিকোর শীর্ষে থাকতেন শিকদার। প্রতিটি শিকো কয়েকটি 'সরকারে', প্রতিটি সরকার কয়েকটি 'পরগনায়' এবং প্রতিটি পরগনা কয়েকটি 'গ্রামে' বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় আমলারা শহুরে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। গ্রামগুলিতে কিছু পরিমাণে স্বায়ত্ত শাসন চালু ছিল।

সুলতানি যুগের সমাপনান্তে ও মুঘল যুগ সূচিত হওয়ার পূর্বে শের শাহের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। যদিও শের শাহ ছিলেন হুমায়ুনের সমসাময়িক ও ভারতে হুমায়ুনের পিতা বাবর ইতিপূর্বেই মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করে গিয়েছেন, তবুও মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আকবরের শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব নীতি অনেকাংশেই শের শাহের প্রচলিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত। শের শাহ জাতে আফগান এবং বিচক্ষণ সংগঠক ও সুদক্ষ সামরিক প্রধান হিসেবে পরিচিত। হুমায়ুনের ভাই কামরান ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে যাবতীয় সমরাভিযানের সময় শের শাহ একটি আমলাতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৫৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে একটি

অসাধারণ শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে কেন্দ্রের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সনাতন ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে তিনি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় এনেছিলেন নানা সংস্কার। উত্তর-ভারতে প্রচলিত অতীত তুর্কি শাসনব্যবস্থা তাঁকে এ-ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছিল। পার্সিভাল স্পিয়ারের মতো কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, তদানীন্তন পার্শি শাসনব্যবস্থা, বিশেষ করে সফাবিদ রাজবংশ, রাজস্ব সংস্কারের ব্যাপারে শেরশাহের অনুপ্রেরণার কেন্দ্র ছিল। শের শাহের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রশাসন বোলো আনা অনুসরণ করেছিলেন আকবর ও তাঁর রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল।

(৪) মুঘল যুগের প্রশাসন : মুঘল যুগের প্রশাসন ও সরকার বিষয়ে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বিষয়টির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

(ক) পররাজ্য আক্রমণকারী ও নিজ রাজ্য রক্ষাকারী হিসেবে মুঘল শাসকেরা : একথা বললে সম্ভবত আদৌ কোনো অত্যুক্তি হয় না যে, ১৫২৬ থেকে ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ভারতীয় ইতিহাস মূলত আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুঘল-আফগান প্রতিযোগিতার ইতিহাস। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত পত্তন সূচিত হয়। আকবর নিজে ছিলেন একজন অসাধারণ বিজেতা। বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুকৌশলে রক্ষা করতেও তিনি জানতেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শাসক। সিংহাসন লাভ করার পরই তিনি রাজ্যজয়ের নেশায় মাতেন। ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে আসিরগড় দুর্গ জয় করা পর্যন্ত আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কৌটিল্য বর্ণিত 'বিজিগীষু রাজা'-র প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সম্রাট আকবর। মুঘল সাম্রাজ্যের মতো এতবড় একটি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্তা ছিলেন তিনিই। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গির, পৌত্র শাজাহান ও প্রপৌত্র ঔরঙ্গজেব-এর শাসনকালেও মুঘল সাম্রাজ্যে বিস্তার-নীতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

(খ) মুঘল শাসনের প্রকৃতি : মুঘল শাসনের প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝতে গেলে প্রথমেই 'ইসলাম' এর প্রকৃতি বোঝা দরকার। 'ইসলাম' কখনই এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেনি যেখানে অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যাগুরু। বস্তুত, অমুসলমান মানুষ কোনো নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারত না। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই কঠোর ছিল যে, 'বাহাই' ও 'কুয়াদানি' নামক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকেও অমুসলমান হিসেবে গণ্য করা হত। এমনকি, শিয়া-রাও প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গণ্য হতেন না। কেবলমাত্র গোঁড়া সুন্নি সম্প্রদায়ের

মানুষেরাই মুসলমান হিসেবে গণ্য হতেন। এহেন ইসলাম ধর্ম ভারতের সংস্পর্শে আসে নবম শতকে। ভারতের বেশিরভাগ মানুষই তখন অমুসলমান। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবর আদৌ গোঁড়া বা ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি হিন্দু বা অমুসলমানদের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ছিলেন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গির ও পৌত্র শাজাহান—দুজনেই এই ধর্মীয় উদারনীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ জাহাঙ্গিরের আমলে মুঘল রাষ্ট্রকে একটি 'সংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্র' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যদিও সকলেই মনে করেন যে ধর্মীয় উদারতায় জাহাঙ্গির ও শাজাহানের তুলনায় আকবর অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের আমলে ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রচণ্ড প্রকট হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত জীবনে ঔরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। তাই, আবার হিন্দুদের ওপর জিজিয়া করের বোঝা চাপিয়ে দেন তিনি। এর ফলে তাঁর আমলে হিন্দুরা ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। চারদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তাঁর আমলেই, বলা যায়, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ উপ্ত হয়।

(গ) বাদশাহ : মুঘল সাম্রাজ্য ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সম্রাট। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধের পর যখন মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, তখন থেকেই ওই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর নিজেকে 'পাদশাহ বলে উল্লেখ করতে শুরু করেন। 'পাদ' কথার অর্থ স্থিতিশীলতা ও 'শাহ কথার অর্থ শাসক। ইসলামিক সংহিতা (code) অনুযায়ী রাজার জনগণ কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত। কেবলমাত্র রাজপরিবারভুক্ত মানুষই সিংহাসনে বসার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। রাজার জীবদ্দশাতেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে খুনোখুনি ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এমনকি, সম্রাট আকবরের শেষ বয়সে যুবরাজ সেলিম (পরবর্তীকালে জাহাঙ্গির হিসেবে সুপরিচিত) বিদ্রোহ করেছিলেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাট শাজাহানকে বন্দী করে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাশিকোকে হত্যা করে। ঔরঙ্গজেব যে কীভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন রাজসিংহাসন, তা আজ কারোরই অজানা নয়। এই ধরনের কুপ্রথা পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের মধ্যে চালু ছিল যা ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে।

(ঘ) অভিজাত সম্প্রদায় : এই সম্প্রদায়ের দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। প্রথমত এটি ছিল একটি নানাধর্মী (heterogeneous) সম্প্রদায়। এখানে তুর্কী, তাতার, পার্শি, হিন্দু ও মুসলমান ভারতবাসী সকলেই ছিল।

দ্বিতীয়ত এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ সরকারি (official) সম্প্রদায়, বংশানুক্রমিক (hereditary) সম্প্রদায় নয়।

(ঙ) মনসবদারি ব্যবস্থা : মুঘল প্রশাসনের প্রকৃতি ছিল সামরিক। সমস্ত জন আধিকারিককেই (public official) সেনা তালিকায় নাম লেখাতে হত। এর ফলে সৃষ্টি হয় মনসবদারি প্রথার যেখানে সামরিক ও অসামরিক—উভয় ধরনের মানুষই ছিল। প্রতিটি সরকারি আধিকারিক 'মনসব' নিয়োগ করতে পারতেন। প্রতিটি 'মনসবদার' সেনাবাহিনীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করতে পারতেন। আকবরের আমলে তেত্রিশ ধরনের মনসব পর্যায় (grade) চালু ছিল। দশজনের মনসবদার থেকে দশ হাজারি মনসবদারি ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায়। এইসব মনসবদার সরসারি চাকরিতে নিয়োগপত্র পেতেন। সম্রাট স্বয়ং তাঁদের পদোন্নতি, বরখাস্ত করা ও অপসারণের জন্য দায়ী থাকতেন। প্রতি পর্যায়ের মনসবদারদের নির্দিষ্ট বেতন চালু ছিল। এর থেকে তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যক হাতি, ঘোড়া, মালবাহী পশু ও গাড়ির ব্যয়ভার বহন করতেন। এই ধরনের পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেত না। এই পদাধিকারীদের যেকোনো নতুন কাজ দেওয়া যেত। এ প্রসঙ্গে রাজা বীরবলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তিনি ছিলেন এক বিচক্ষণ ও আদর্শ সভাসদ যিনি যুদ্ধের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হন ও সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সরকারি আধিকারিকদের দু-ভাবে বেতন দেওয়া হত—অর্থ ও জায়গাজমি। আবুল ফজল রচিত **আইন-ই-আকবরী** গ্রন্থে মুঘল আধিকারিকদের অসম্ভব উচ্চ বেতনের কথা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড বলেন যে, বরাদ্দকৃত ও যাবতীয় খরচাখরচ বাদ দিয়ে একজন পাঁচহাজারি মনসবদারের হাতে সেইযুগে কমপক্ষে আঠারো হাজার ভারতীয় টাকা মাসিক বেতন হিসেবে থাকত। সরকারি চাকরির প্রকৃতি আকবর, জাহাঙ্গির ও শাজাহানের সময়ে একই ছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের আমলে তা ক্রমশ নিকৃষ্ট মানের হতে থাকে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ : মুসলিম মন্ত্রীরা ছিলেন নিতান্তই রাজা বা সম্রাটের সহকারী। রাজা ইচ্ছেমতো মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন; কিন্তু একাজে তিনি বাধ্য থাকতেন না। মন্ত্রিপরিষদ রাজার কাছে দায়িত্ববদ্ধ থাকতেন। এঁদের সংখ্যা নিয়ে মুসলিম সংহিতায় (code) কিছু বলা নেই। ঠিক তেমনি এঁদের নিয়োগ প্রণালী ও যোগ্যতা বিষয়েও সংহিতা নীরব। মন্ত্রীদের মধ্যে ভাকিল (Vakil) বা ওয়াজির (Wazir) পদাধিকারীরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বাবর ও হুমায়ুন—দুজনেই 'ওয়াজির' পদাধিকারী মন্ত্রীদের নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আকবর সিংহাসন পাওয়ার সময় প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না বলে তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁ 'ভাকিল-ই-সুলতানাৎ' হিসেবে সাম্রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন।

১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই আকবর তাঁর অভিভাবকের শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং 'ভাকিল' ও 'ওয়াজির'—এই দুই পদকে পৃথক করে দেন। 'ভাকিল' পদটি শাজাহানের সময় পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর ধীরে ধীরে পদটির গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। তখন থেকেই 'ওয়াজির' পদাধিকারীরা হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা।

(ছ) রাজস্ব ব্যবস্থা : এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জমি জরিপ ও পরিমাপ করা, জমিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং জমির মূল্য নির্ধারণ করা। আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল সর্বপ্রথম গুজরাতে একটি নতুন ধরনের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থায় জমিকে চারভাগে ভাগ করা হত। 'পোলাজ' নামক জমি ছিল প্রতি বছর চাষের অনুকূল। 'পার্তি' নামক জমিকে কিছু সময়ের জন্য ফেলে রাখা হত যাতে তা পরে চাষের অনুকূল হয়ে ওঠে। 'চাচার' নামক জমিকে তিন/চার বছরের জন্য ফেলে রাখা হত। 'বাঞ্জার' নামক জমি পাঁচ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য অনাবাদী পড়ে থাকত। গুজরাতে প্রচলিত এই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা 'রায়তওয়ারি' ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। উত্তর-ভারতে ব্রিটিশচালিত জমিদারি ব্যবস্থা থেকে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল।

রাজস্ব আদায়ের এবং প্রশাসনের সুবিধের জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি 'সুবা'য় বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি সুবা কয়েকটি 'সরকারে', প্রতিটি সরকার কয়েকটি 'পরগনা'য় এবং প্রতিটি 'পরগনা' কয়েকটি 'গ্রামে' বিভক্ত ছিল। 'মালগুজার' নামক একজন আধিকারিক প্রতিটি জেলায় রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। একাজে তাঁকে বেশ কিছু আধিকারিক সাহায্য করতেন।

(জ) সৈন্যবাহিনী : মুঘল সৈন্যবাহিনীর প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা নানামত পোষণ করেন। আবুল ফজল রচিত **আইন-ই-আকবরী** গ্রন্থ থেকে আমরা পাই, ৩,৮৬,৬১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য, ৪২,১৩,৩৮২ জন পদাতিক সৈন্য, ১,৮৬৩ টি হাতি, ৪,২০০ টি কামান এবং ৪,৫০০ টি নানা ধরনের জাহাজ মুঘল বাহিনীর অন্তর্গত ছিল। 'মনসবদারি' ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রচিত অশ্বারোহী বাহিনীই ছিল মুঘল সেনাদের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। পদাতিক বাহিনীর কেউ কেউ সরাসরি যুদ্ধে যোগ দিত, কেউ দিত না। প্রথম দলের সৈন্যরা তীর ও গোলা ছুঁড়ত এবং তরবারি ও লাঠি ব্যবহার করত। দ্বিতীয় দলের সৈন্যরা আজ্ঞা বহন করত, জল দিত, কুস্তি করত, তাঁবু ফেলত ও দূত হিসেবে কাজ করত।

(ঝ) বিচারব্যবস্থা : নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল মুঘল বাদশাদের প্রধান কর্তব্য। উদারতান্ত্রিক শাসকেরা হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য

একই বিচারব্যবস্থা চালু করেন
বা বিচার-ভেঁপুর বন্দোবস্ত ক
এর ব্যবস্থা চালু হয় যা
শাহাজানও নিরপেক্ষ বিচারব
ছিলেন ভয়ানক গোঁড়া সুন্নি
শরিয়তের শাসন চালু করতে
দিনে সাধারণ প্রজাদের অভা
ও প্রদেশগুলিতে বিস্তারিত
শীর্ষে থাকতেন স্বয়ং বাদশা
ছিলেন।

(ঞ) পুলিশ : শহরাঞ্চ
ছিলেন কোতোয়াল। এঁর প্রধ
চোর ধরা, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ
বন্দোবস্ত করা, গৃহ, জনপদ
পথিকদের চলাফেরার উপর
সম্পর্কে নানা তথ্য আদায়
রাখা, গবাদি পশু হত্যা বন্ধ
না করা—এ সবই মুঘল যু

(ট) নানাবিধ কল্যাণমূ
প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা।
করেছিল। এ বিষয়ে কাজ ক
সরকার, গ্রামাঞ্চলে গ্রাম প
কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও
অসংখ্য মসজিদ, মকবারা,
বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে অবস্থি
সেতু হিসেবে নির্মিত হয়েছি
সুনিবিড় 'বৃক্ষ' রোপণ করা
সড়কগুলির ধারে নির্দিষ্ট দূ
এখানে স্বল্প সময়ের জন্য
ও পুকুর কাটা হত এবং
জন্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা

একই বিচারব্যবস্থা চালু করেন। হুমায়ুন তাঁর স্বল্পমেয়াদি শাসনকালে তবল-আদাল বা বিচার-ভেঁপুর বন্দোবস্ত করেন। তাঁর পৌত্র জাহাঙ্গিরের সময়ে সোনার চেন-এর ব্যবস্থা চালু হয় যা যেকোনো সুবিচারপ্রার্থী প্রজাই বাজাতে পারতেন। শাহাজানও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন ভয়ানক গোঁড়া সুন্নি মুসলমান শাসক। তিনি তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে শরিয়তের শাসন চালু করতে চেয়েছিলেন। এরই মধ্যে তিনি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে সাধারণ প্রজাদের অভাব-অভিযোগ মন দিয়ে শুনতেন। তাঁর সময় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে বিস্তারিত বিচারব্যবস্থা চালু ছিল। গ্রামে ও নগরে আদালতের শীর্ষে থাকতেন স্বয়ং বাদশাহ যিনি খলিফা হিসেবে বিচারবিভাগীয় কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।

(ঞ) পুলিশ : শহরাঞ্চলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক আধিকারিক ছিলেন কোতোয়াল। এঁর প্রধান কর্তব্য ছিল শহরের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। চোর ধরা, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা, ওজন ও পরিমাপ স্থির করা, রাতে পাহারার বন্দোবস্ত করা, গৃহ, জনপদ ও নাগরিকদের সংখ্যা ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা, পথিকদের চলাফেরার উপর নজর রাখা, গুপ্তচর নিয়োগ করা, প্রতিবেশী গ্রামগুলি সম্পর্কে নানা তথ্য আদায় করা, মৃত বা নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পত্তির হিসেব রাখা, গবাদি পশু হত্যা বন্ধ করা, ইচ্ছের বিরুদ্ধে হিন্দু বিধবাদের সহমরণে বাধ্য না করা—এ সবই মুঘল যুগে কোতোয়ালদের করতে হত।

(ট) নানাবিধ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা : মুঘল রাজাদের প্রধান কর্তব্যই ছিল প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা। সরকার তাই নানাবিধ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছিল। এ বিষয়ে কাজ করতেন বাদশাহ বা সম্রাট, কেন্দ্রীয় সরকার, আঞ্চলিক সরকার, গ্রামাঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহরাঞ্চলে পৌরশাসনব্যবস্থা। এছাড়াও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও এ ধরনের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকত। এই যুগে অসংখ্য মসজিদ, মকবারা, মিনার, দুর্গ, প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে অবস্থিত বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহরের মধ্যে সংযোগকারী সেতু হিসেবে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য সড়ক। এইসব সড়কের দুপাশে ছায়া-সুনিবিড় 'বৃক্ষ' রোপণ করা হয়েছিল। কুয়ো ও পুকুরের সুবন্দোবস্ত ছিল। সড়কগুলির ধারে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর ছিল ধর্মশালা ও সরাইখানা। পথিকেরা এখানে স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে পারতেন। সেচের সুবিধের জন্য খাল ও পুকুর কাটা হত এবং বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হত। শিশু ও অসুস্থদের জন্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণের স্নানাগারগুলি ছিল রীতিমত

দর্শনীয়। উন্নত ডাক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। খরা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত অচলাবস্থা মোকাবিলা করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হত।

(ছ) প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক প্রশাসন : প্রশাসনের সুবিধার্থে সুবিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবা বা প্রান্তে ভাগ করা হয়েছিল। এগুলির সংখ্যা সময়বিশেষে পরিবর্তিত হত। প্রদেশগুলিকে কয়েকটি সরকারে (আধুনিক কালের জেলার মতো) এবং সরকারগুলিকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হত। এগুলিই ছিল প্রধান কয়েকটি প্রশাসনিক ও রাজস্ববিভাগীয় একক (unit)। সুবা বা প্রদেশের প্রধানকে বলা হত সুবেদার। এঁকে স্বয়ং বাদশাহই নিয়োগ করতেন। এই ধরনের উচ্চ ক্ষমতাশালী আধিকারিকেরা তাঁদের সামরিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক গুণাবলী বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য মনোনীত হতেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুটি বিভাগ ছিল। সুবেদারেরা একইসঙ্গে দেওয়ানী ও সামরিক—উভয় প্রকার প্রশাসনেরই শীর্ষে থাকতেন। কিন্তু রাজস্ব ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। এসব ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন দেওয়ান যিনি বাদশাহ কর্তৃক চাকরিতে বহাল হতেন। সমগ্র সামরিক ও দেওয়ানী প্রশাসনের মাথা ছিলেন সুবেদার। ফৌজদার থেকে শুরু করে যাবতীয় অধস্তন আধিকারিকেরা তাঁর অধীনে ছিলেন। ঠিক তেমনি, রাজস্ব বিভাগের মাথা ছিলেন দেওয়ান। সুতরাং, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুবেদার দেওয়ানের উপর নির্ভর করতেন। সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে দেওয়ান নির্ভর করতেন সুবেদারের উপর।

আঞ্চলিক প্রশাসনের তেমন কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। গ্রাম দেখভাল করত গ্রাম-পঞ্চায়েত। বর্তমান কালের পৌর প্রশাসনের মতো কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা মুঘল যুগে ছিল না।

(৫) ব্রিটিশ যুগের প্রশাসন : বর্তমান ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ যুগের প্রশাসনিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে রচিত। ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে গড়তে ওই প্রশাসনিক কাঠামোর অবদান অপরিসীম। এই যুগের প্রশাসন আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পড়ব।

(ক) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকাল ধরা হয় ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর যখন ব্রিটিশরাজ কয়েকজন বণিককে প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে 'ভারতবর্ষ' নামক এক সুবিশাল ভূখণ্ড ও অসীম

রাজনৈতিক ক্ষমতা। কোম্পানি তখন বণিক ছাড়াও অসংখ্য ক্লার্ক, পেশকার ইত্যাদি নিয়োগ করে। কোম্পানির দুটি চালিকাশক্তি ছিল : বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্। প্রথমটি ছিল দ্বিতীয়টির তুলনায় আরও বেশি ক্ষমতাশালী সংগঠন, কারণ এটিকে নিয়োগ করত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট।[৩] কোর্ট অফ ডিরেক্টরের সদস্যেরা কোম্পানির প্রোপ্রাইটরদের দ্বারা মনোনীত হতেন। কোম্পানির কর্মচারিদের দুটি ভাগে ভাগ করা যেত।

(১) সনদপত্র দ্বারা স্বীকৃত কোম্পানি কর্মচারি ও

(২) সনদপত্র দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন কোম্পানি কর্মচারি।

প্রথম দলে কেবল শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরাই ঠাঁই পেতেন। এঁরা কোম্পানির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন ও কোম্পানিকে সর্ব উপায়ে রক্ষা করতেন।[৪] দ্বিতীয় দলে ভারতীয়, পার্শি, ইংরেজ ও পর্তুগীজ জাতের লোক ঠাঁই পেতেন। এঁদের কাউকে কোম্পানির সনদপত্রে সই করতে হত না।

(খ) কোম্পানির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান : ভারতীয় সরকারের গঠনকাঠামো কীরকম হবে তা নির্ধারিত হয়েছিল ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী। বাণিজ্য ব্যতীত কোম্পানির অন্যান্য কার্য সম্পাদনেরও অধিকার এই আইনের দ্বারাই স্বীকৃত হয়।[৫] আইনটি মূলত বাংলা প্রেসিডেন্সিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোম্পানি এখানে একজন গভর্নর জেনারেল ও চার সদস্যের একটি কাউন্সিল নিয়োগ করত। গভর্নর জেনারেলকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি দেখভালের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। ১৭৭৩ সালের এই আইনের বলে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হলেন। হেস্টিংস-এর অধীনে থেকে কোম্পানির কর্মচারিরা তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বাড়িয়ে তুললেন।

বলতে গেলে, কর্মচারিরা "বাণিজ্যিক অভিযাত্রী" বা "ভাগ্যান্বেষণকারী" থেকে উন্নীত হলেন আধুনিক যুগের "জনপ্রশাসনিক আমলায়"।[৬] কোম্পানি বণিক থেকে পরিণত হল সরকারে। রাজস্ব ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার যাবতীয় কাজ পেল কোম্পানি। ধীরে ধীরে সৃষ্ট একটি পুলিশ রাষ্ট্রের কাজকর্মের গোড়াপত্তন হচ্ছিল সেই সময়।

সচিবালয় (Secretariat)—যা আধুনিক প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—তারও সূচনা হয় কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে। কারখানার করণিক বা ক্লার্কদের অফিসেই নিহিত ছিল সচিবালয়ের মূল ভিত্তি। মাদ্রাজ ও বাংলায়

গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে একজন করে সচিব (Secretary) থাকতেন। তাঁকে সাহায্য করতেন পাঁচ/ছয়জন ছোটখাট সরকারি কর্মচারি। এই কাঠামোটিকে আরও উন্নত করলেন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উত্তরসূরী লর্ড কর্ণওয়ালিস। ইনি উদারনৈতিক বেতনব্যবস্থা চালু করেন। কর্মচারিরা এখন থেকে একইসঙ্গে সৎ ও বিত্তশালী হতে পারতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব বিভাগ থেকে শুল্ক বিভাগকে পৃথক করে দেন। পূর্ববর্তী যুগের কালেক্টরদের তুলনায় তাঁর যুগের জেলা-আধিকারিকেরা (District Officers) অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতেন।

লর্ড ওয়েলেসলির আমলে (১৭৬০-১৮৪২) আমলাতন্ত্রের একটি নবযুগ সূচিত হয়েছিল, আমলাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওয়েলেসলির অবদান অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে কোম্পানির কাজকর্ম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ১৮০০ সালের মে মাসে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আদেশ জারি করেন। এখানেই কোম্পানির কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ১৮০০ সালের নভেম্বর মাসে ওই কলেজ খোলা হয়।

এর পরবর্তী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান—ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ—১৮০৫ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টরের আদেশবলে ইংল্যান্ডে চালু হয়।

১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার ২০ বছরের জন্য নবীকরণ করা হয়। সুবিশাল বাংলা প্রেসিডেন্সিকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—বাংলা ও আগ্রা।

এরপর চালু হয় ১৮৫৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট। চাকরিতে আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতার (patronage) নীতিটি বিলুপ্ত হয়। সরাসরি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরিতে প্রবেশ করা যেত। লন্ডনে অবস্থিত সিভিল সার্ভিস কমিশন একটি ভর্তি-পরীক্ষার বন্দোবস্ত করত। প্রার্থীদের বয়ঃসীমা ছিল ১৯-২২ বৎসর।

মেকলে কমিটির নিয়োগ নীতি অনুসারে ভারতের মাটিতে প্রথম কিছু নিয়োগ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। শুরু হয় একগুচ্ছ প্রশাসনিক সংস্কার। ব্রিটিশ সরকার এরই জন্য বসাতে থাকে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি, বোর্ড ও স্টাডি টিম। মেকলে কমিটির রিপোর্টকেই (১৮৫৪) প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের 'বাইবেল' হিসেবে ধরা হয়। এটি স্পষ্টভাবে বিবৃত করে যে, উচ্চ সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হতে গেলে ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সী প্রার্থীদের একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

(গ) ১৮৫৮ ও তার পরবর্তী সময় : ১৮৫৭ সালে সিপাই-বিদ্রোহ—যা একটি মহাবিপ্লব বা মহারণের রূপ নিয়েছিল—ভারতীয় প্রশাসনে প্রাথমিক কিছু পরিবর্তন আনে। প্রথমেই উল্লেখ্য, ১৮৫৮ সালের আইন প্রবর্তন। এই আইনবলে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস' ও 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' নামক কোম্পানির দুটি চালিকাশক্তি বিলুপ্ত হয়। কোম্পানির যাবতীয় ক্ষমতা—সরকার, ভূখণ্ড ও রাজস্ব—হস্তান্তরিত হয় ইংরেজ রাজশক্তির কাছে। অতিরিক্ত প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া পদ ও প্রতিষ্ঠান চালু হয়। এগুলি বাদ দিলে, ১৮৫৮ সালের আইনের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থায় বিরাট কোনো পরিবর্তন চালু হয়নি। গভর্নর জেনারেল একইরকম ক্ষমতাশালী রয়ে যান। সেক্রেটারি অফ স্টেটের মাধ্যমে সরকারি চাকরির শর্তগুলি নির্ধারিত হতে থাকে। সেই সময়ে সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল :[৮]

(১) গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষয়,

(২) জাতিগত, সংস্কৃতিগত বা ভাষাগত নৈকট্য স্বীকার না করেই কয়েকটি প্রদেশে ভারতকে ভাগ করা,

(৩) জনগণের উপর বিপুল করভার চাপানো ও সামরিক বিভাগের জন্য বিপুল ব্যয়,

(৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ ইত্যাদিতে অমনোযোগী হওয়া,

(৫) জাতীয় শিল্প ও কৃষি উপেক্ষা করা, যার ফল দাঁড়িয়েছিল প্রচণ্ড দারিদ্র্য, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ,

(৬) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও চলাফেরার উপর স্বাধীনতা খর্ব করে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দেওয়া।

১৮৫৯ সালে লর্ড ক্যানিং প্রবর্তন করেন "পোর্টফোলিও ব্যবস্থা"। সরকারি কাজকর্ম কেন্দ্রের পরিবর্তে বেশ কয়েকটি শাখায় (branch) বিভক্ত করে দেওয়াই ছিল "পোর্টফোলিও ব্যবস্থার" মূল বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে সাঙঘাতিক রকমের কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রকে কিছুটা দুর্বল করাই ছিল "পোর্টফোলিও ব্যবস্থার" উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থায় সরকারি কাজকর্মের ভার দেওয়া হল গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের বিভিন্ন সদস্যকে। ১৮৬১ সালে এই ব্যবস্থা চালু হল। একে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার জনক বলা যায়।

১৮৬১ সালের আইনের মাধ্যমে স্থির হল অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর যথাক্রমে অর্থ সম্পর্কিত ও ভিতরের শাসনকার্য সম্পর্কিত বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে। এই আইনের দ্বারা অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারটি আদৌ চালু হয়নি। বম্বে ও মাদ্রাজের আইনকক্ষগুলি তাদের হৃত ক্ষমতার কিছুটা ফিরে পেয়েছিল। অন্যান্য প্রদেশেও নতুন নতুন আইনসভা চালু হল।

লর্ড রিপন ভারতে ছিলেন ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত। স্বায়ত্তশাসনের ধ্যানধারণা ওই সময় থেকেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ব্রিটেনের উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন ওই সময়ে ঘোষণা করেন : "স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও আশীর্বাদ ভারতকে দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।" ১৮৮০ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই এতটুকু সময় নষ্ট না করে তিনি লর্ড রিপনকে ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে পাঠান। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪—এই স্বল্প চার বছরের মধ্যেই রিপন ভারতের গ্রাম ও শহরের জন্য একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁর উদার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষানীতি, ইলবার্ট বিল ইত্যাদির মতোই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—একথা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত।

১৮৮৬-৮৭ সালে বসল এচিসন কমিশন। এই কমিশন একটি অধস্তন স্থানীয় প্রশাসনিক সংগঠন তৈরির কথা বলে। এর ফলে, কমিশনের মতে, স্থানীয় চাহিদাগুলি পূর্ণ হবে। প্রাদেশিক প্রশাসনের নীচে একটি অধস্তন প্রশাসন গঠিত হল। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, তিনটি প্রশাসনিক কৃত্যক (সার্ভিস) চালু হয় : (১) রাজতান্ত্রিক প্রশাসনিক কৃত্যক (সার্ভিস), (২) প্রাদেশিক প্রশাসনিক কৃত্যক (সার্ভিস) ও (৩) অধস্তন প্রশাসনিক কৃত্যক (সার্ভিস)।

১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট দ্বারা আইনসভার কাজকর্ম আরো বাড়ানো হয়। যদিও প্রত্যক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়নি, এর প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়েছিল।

মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯০৯ সালের আইনের মাধ্যমে আইনসভার আকার আরো বৃদ্ধি পায়।

এরপর আসে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন। এই আইনের মাধ্যমে মূলত প্রাদেশিক সরকারগুলির গঠনে পরিবর্তন আসে। 'দ্বৈত শাসন' (Dyarchy) নামক একরকম সরকারি ব্যবস্থা চালু হয়। প্রাদেশিক তালিকার বিষয়গুলিকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

যেমন স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, সংবাদপত্র, অর্থ—ইত্যাদিকে 'সংরক্ষিত' তালিকায় রাখা হয়। 'হস্তান্তরিত'—এই তালিকায় রাখা হয় ঔষধপত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা—ইত্যাদি বিষয়।[৯] স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন একটি প্রাদেশিক ও হস্তান্তরিত বিষয়ে পরিণত হয়।

যেহেতু 'দ্বৈত শাসন' (Dyarchy) নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকার ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কৃত্যক বা সার্ভিসের উপর একটি রাজ-কমিশন নিয়োগ করল। এর দায়িত্বে ছিলেন লর্ড লী। ফেডেরাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হল একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যকে নিয়ে। ১৯২৬ সালের ১লা অক্টোবর থেকে এটি কাজ শুরু করে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশে 'দ্বৈত শাসনের' পরিবর্তে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিষয়কে তিনটি তালিকায় আনার চেষ্টা করা হল—কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। পরিকল্পনার জন্য একটি বিভাগ চালু হল ১৯৪৪ সালে। কিন্তু দুবছর বাদেই বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিকে তিনটি পৃথক বিভাগে পরিণত করা হল।

বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতীয় প্রশাসন বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখোমুখি হয়। আসে গুচ্ছ গুচ্ছ সংস্কার। মুঘল শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও ব্রিটিশ শাসকেরা চালু করলেন। এইভাবে ভারতীয় প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের সহাবস্থান।

(৬) স্বাধীন ভারতের প্রশাসন : ১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়েছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বয়স ৫৭-৫৮ বছর পূর্ণ হল। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অনেক উন্নতিসূচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। একইসঙ্গে জাতীয় প্রশাসনের চিত্র বেশ কয়েকটি অন্ধকারময় দিকের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। খুব সংক্ষেপে এই নেতিবাচক দিকগুলি আমরা তুলে ধরব।

(ক) রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অস্থায়িত্ব : স্বাধীন ভারতের ৫৭-৫৮ বছরের প্রৌঢ় জীবদ্দশায় রাজনৈতিক চিত্রে পরিবর্তন এসেছে বারংবার। জন্মলগ্ন থেকে প্রথম ৩০ বছর অর্থাৎ ১৯৪৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ন্ত্রণ করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। মাঝে একমাত্র ১৯৬৭ সালের চতুর্থ লোকসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস দল কেন্দ্রে যৎসামান্য গরিষ্ঠতা পেয়েছিল, রাজ্যগুলির বেশ কয়েকটিতে হয়েছিল কংগ্রেসের ভরাডুবি। অনেক রাজ্যেই

"সংযুক্ত বিধায়ক দল" ক্ষমতায় এসেছিল। ১৯৭০-৮০ সাল পর্যন্ত চলে জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন থাকা। ১৯৮০-৮৯ সাল পর্যন্ত আবার জাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে আসে কংগ্রেস দল। ১৯৮৯-৯১ সালে জনতা দল ও সমাজবাদী জনতা দল ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৯১-৯৬ সাল পর্যন্ত আবার কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কাণ্ডারীর আসন গ্রহণ করে। ১৯৯৬ ১৯৯৭ সালে দেবেগৌড়া ১৩টি বিরোধী দলের একটি সম্মিলিত জোটের নেত হিসেবে কেন্দ্র শাসন করেন। ১৯৯৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন আই. কে. গুজরাল। কিন্তু কংগ্রেস দল সমর্থন সরিয়ে নিলে গুজরালের যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রে মাত্র ৮ মাস স্থায়ী থাকার পরেই পদত্যাগ করে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) শাসন করে। ২০০৪ সালে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের পর আবার ক্ষমতায় আসে জাতীয় কংগ্রেস। বিভিন্ন রাজ্যেও BJP-র সমর্থক দলগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও কংগ্রেসের সমর্থক দলগুলি তুলনায় অনেক ভাল ফলে করে।

(খ) ভারতকে বিভিন্ন স্বাধীন প্রদেশে বিভক্ত করার জন্য চাপ ও ভীতি প্রদর্শন : সংবিধান অমান্য করে বারংবার ভারতকে টুকরো টুকরো করার হুমকি এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে। ভারতের ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে এসেছে ঘন ঘন আঘাত। শান্তি ও অহিংসার উপর মাথাচাড়া দিয়েছে অশান্তি ও হিংসার আগুন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে জম্মু-কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীরা মাঝেমাঝেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বীয় স্বীয় অঞ্চলে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য সোচ্চার হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বে ULFA গোষ্ঠী বা কামতাপুরী গোষ্ঠীও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে নেমেছে বারংবার। দক্ষিণে তামিলনাড়ু অঞ্চলে এল. টি. টি. ই. গোষ্ঠীও সহিংস ও সশস্ত্র হয়ে উঠেছে বহুবার। ঝাড়খণ্ড ও উত্তরাখণ্ড—এই দুটি প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে আন্দোলনেরই ফল হিসেবে।

(গ) শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা : শাসক দল হিসেবে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কংগ্রেস দলের প্রথম ও প্রধান ত্রুটি ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অনেক উপরে উন্নয়নেক স্থান দেওয়া। একথা ঠিক যে, ভারতের মতো একটি অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে উন্নয়নকে অবশ্যই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কিন্তু, একইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। যখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভা ক্রমাগত নতুন আইন তৈরি করছে ও পুরনো আইন সংশোধন করছে, তখন জনগণের একটা বড় অংশ আইন মান্য করছে

না। "জোর যার মুলুক তার"—এই অরাজক নীতি প্রদর্শিত হচ্ছে বারংবার। হিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।

(ঘ) প্রশাসনের উপর অতিরিক্ত চাপ : ভারতীয় প্রশাসনে গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি নতুন নতুন বিভাগ চালু হয়েছে। প্রশাসনের উপর তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত চাপ। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের লগ্নে ভারতের যাবতীয় সরকারি কাজ পরিচালনা করত ১৮টি মন্ত্রক। ১৯৪৭-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১৬ জন মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৩-এ সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০-এ এবং ১৯৮৭-তে ৬৮-তে। মন্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের পাশাপাশি প্রতিটি মন্ত্রীর বিভাগে সচিব ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মীর সংখ্যাও দর্শনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সচিবালয়ের আধিকারিক সংখ্যা কী ভীষণ হারে বেড়েছে, তা নিম্নে দর্শিত সারণীটি[১০] থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যাবে।

পদের নাম	১৯৭৩	১৯৯১
সচিব/বিশেষ সচিব	৫০	১২৪
অতিরিক্ত সচিব	৪৪	১০৩
যুগ্ম সচিব	২১৯	৪১১
অধিকর্তা	১২৪	৩৬৯
উপ-সচিব	৪০৪	৫২৫
আন্ডার-সেক্রেটারি	৬১৭	১১২৪

এইভাবে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা অসুবিধে সৃষ্ট হয়। বিভিন্ন মন্ত্রক, দপ্তর, সচিবালয়ের অফিস, সরকারি পদ, বোর্ড, কমিশন, উপদেষ্টা পরিষদ, নতুন নতুন সাংবিধানিক বা আইনগত পরিষদ—সবেরই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বোধহয় দেশের কোনো নাগরিকের পক্ষেই বর্তমানে এই সংখ্যা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়।

আলোচনায় উপসংহার টানাব ভারতীয় প্রশাসনের মার্কিন ধারাভাষ্যকার পল. এইচ. অ্যাপ্‌লবি-র একটি উদ্বৃতি দিয়ে। আমাদের রাজনীতি ও সমাজের প্রশাসনিক রূপ আঁকতে গিয়ে তিনি একটি অসামান্য মন্তব্য করেন : "There are, both

in the Indian Constitution and in present society and practice, factors making for unity and factors making for disunity. Since success of India as a nation is the prerequisite to all other kinds of success here including the success of the states—it may be useful to attempt to identify these factors and to ask whether those making for unity are sufficient."[১১]

টীকা ও মন্তব্য :

১. অবস্থি অ্যাণ্ড অবস্থি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইন্ডিয়া, নবম সংস্করণ, লক্ষ্মী নারায়ণ আগরওয়াল, আগ্রা, পৃঃ ১।

২. রমেশ কে. অরোরা অ্যাণ্ড রজনী গোয়েল, ইন্ডিয়ান পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিশ্ব প্রকাশন, নিউ দিল্লি, পুনর্মুদ্রিত, ২০০১, পৃঃ ৯।

৩. বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য, কুক টেলর, এ পপুলার হিসট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, দিল্লি, মিত্তাল, ১৯৮৭, পৃঃ ৪৯১।

৪. বি. বি. মিশ্র, দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হিসট্রি অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০, পৃঃ ২০১।

৫. জর্জ চেসনি, ইন্ডিয়ান পলিটি, নিউ দিল্লি, মেট্রোপলিটান, ১৯৭৬, পৃঃ ৩৭।

৬. আর. দ্বারকাদাস, রোল অফ হাইয়ার সিভিল সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া, বম্বে, পপুলার বুক ডিপো, ১৯৫৮, পৃঃ ৮।

৭. চেসনি, ঐ, পৃঃ ৪৮।

৮. এম. ভি. পাইলি, কন্সটিটিউশনাল গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, বম্বে, এশিয়া, ১৯৬৮, পৃঃ ৬৫।

৯. পাইলি, ঐ, পৃঃ ৮২।

১০. অবস্থি অ্যাণ্ড অবস্থি, ঐ, পৃঃ ৩৭।

১১. পি. এইচ. অ্যাপ্‌লবি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইন্ডিয়া : রিপোর্ট অফ এ সার্ভে, নিউ দিল্লি, ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়াট, ১৯৫৩, পৃঃ ২-৫।